ভূমিকা

(ক)

ভারতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হইল বেদ। বেদের সার উপনিষদ। উপনিষদের নির্যাস গীতা — শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন: "গীতা তু অর্জুনস্য ভীষ্মপর্বা-তর্গতা কর্মোপাসনা জ্ঞানকাণ্ড এয়াত্মিকাষ্টাদশাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ। যথা ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতীর্থশ্চ কৃৎস্নশঃ। গীতায়ামস্তি তেনেরং সর্বশাস্ত্রময়ী মতা। ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ত্রিংশবৎ ষটকত্রয়েন হি। কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে।"

গীতামাহাত্ম্যে গীতার অনন্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাসূচক উক্তি :

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃ সৃতা॥

গীতা অনেক প্রকারের আছে ------ ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মগীতা, শিবগীতা, রামগীতা, সাবিত্রীগীতা, পাণ্ডবগীতা, অনুগীতা, ভগবতী গীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, গোপীগীতা ইত্যাদি। সাধারণতঃ গীতা বলিতে ভগবদ্গীতাকেই বুঝায়। কারণ অন্যান্য গীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুকরণে মুখ্যতঃ বিশেষ শাস্ত্রসার হিসাবে গীতা কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য নানা প্রবন্ধে ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কখনও ভগবদ্গীতা, গীতা কখনওবা বহুবচন প্রয়োগে 'গীতাঃ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কখনও কখনও এই গ্রন্থ 'ঈশ্বর গীতা' নামেও অভিহিত করা হয়। কাদম্বরীতে অনু-তগীতা এবং প্রাচীন ভাবানুবাদে অর্জুনগীতা বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতা শব্দে লৌকিক ব্যবহারে গীতা গ্রন্থখানিকেই বুঝাইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রনাম মন্ত্রে আছে— "গীতামৃত দুহে নমঃ।" অর্থাৎ গীতামৃতদোহনকারীকে প্রনাম করি। কিন্তু গীতামৃত দোহন করিবেন কিরূপে? গাভী কোথায়? বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার উত্তর দিয়াছেন—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

"গাভীর অভাব কি। দোহনকারী ত গোপনন্দন। তিনি গোপাল গোপনন্দন। গো শব্দে বেদ। বেদের জ্ঞানতত্ত্ব বা উপনিষদ হইতেছেন গাভী। তৃতীয় পান্ডব অর্জুন হইতেছেন বৎস। অমৃতময়ী গীতা হইতেছেন সুস্বাদু দুগ্ধ। এই অপ্রাকৃত সুধার ভোক্তা হইতেছেন জগতের সুধীবর্গ। এই মধুর দৃষ্টান্তে বোঝানো যাইতেছে যে গীতা বেদের সার, উপনিষদের নির্যাস।

উপ উপসর্গে নি পূর্বক সদ্ ধাতু হইতে উপনিষৎ। নিকটে নিষন্ন হইয়া কাছে উপবেশন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করে শিষ্য গুরুর নিকট, ভক্ত ভগবানের নিকট— তাহা উপনিষদ। এই ব্যুৎপত্তিতে গীতাই প্রকৃষ্ট উপনিষদ, সকল শ্রুতির সারতত্ত্ব গীতোপনিষদ। শ্রীভগবান কর্তৃক গীত বলিয়া ইহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্।

"শ্রুতিগণ ধেনু দুহিলেন কানু
পার্থ পিয়াসী বৎস।
পিয়ে নিরবধি সজ্জন সুধী
গীতা দুগ্ধ শান্তি উৎস।" (১)

উপনিষৎ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাহার বিশেষণ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকৃত গীত 'গীতা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

(খ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতীয় আধ্যাত্মজীবনচর্চার অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থরূপে দীর্ঘকাল যাবৎ সুপরিচিত। গীতার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাচীন আচার্যগণের ধ্যানে গীতার যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্॥
অদ্বৈতামৃতবর্ষিনীং ভগবতীমষ্টা দশাধ্যায়িনীম্।
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিনীম্॥

লক্ষনীয় যে মহাভারতের মধ্যস্থলে গীতার অবস্থান—"মধ্যে মহাভারতম্" মহাভারত শব্দটি এই স্থানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডক্টর মহানামব্রতব্রহ্মচারীজীর দৃষ্টিতে মহাভারত বলিতে তিনটি বস্তু বুঝায়। "মহাভারত একটি গ্রন্থের নাম, মহাভারত একটি ভূখণ্ডের নাম, মহাভারত সেই ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির নাম।

... ...

মহাভারতের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ। ভীষ্ম পর্ব হইতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ, দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মধ্যস্থল। ইহার আগে সূচনা ও প্রস্তুতি, ইহার শেষে সংগ্রাম ও পরিণতির মধ্যস্থলে গীতার আবির্ভাব। এইরূপ সঙ্কটময়স্থলে গীতার মত একখানি গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থের জন্ম আর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।

মহাভারত বলিতে শুধু গ্রন্থখানিকেই বুঝায় না একটি বিরাট ভূখণ্ডকেও বুঝায়। তুষারশুভ্র হিমগিরি যাহার শিরের শোভা বাড়ায়, অসীম নীলসমুদ্র যাহার চরণ ধোয়ায় সেই বিশাল ভূমিখণ্ডের নাম মহাভারত। অংশবিশেষে খণ্ডিত কর্ত্তিত বা অপহৃত নহে।

নীল নদী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভারতের নাম মহাভারত (Greater India) ইহার মধ্য স্থলে গীতার স্থান। স্কেলে মাপিলে কুরুক্ষেত্র হয়ত ঠিক মধ্যস্থলে নহে। কিন্তু তৎকালীন ভারতের কর্মময় জীবন চাঞ্চল্যের ইহা তখন মধ্যস্থল। কুরুক্ষেত্র কর্মভূমি, যুদ্ধভূমি। ব্রহ্মতত্ত্ব গবেষনার ভূমি নহে অথচ সেইখানে গীতার জন্ম। ইহা এক বিচিত্র বার্তা।

ভারতের ঋষিদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশস্থান অরণ্য। আরণ্যক নাম তাহাদের গায়ে এখনও লাগিয়া আছে। ভোগ জীবনের অবসানে বানপ্রস্থী হইয়া বনে গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছেন ও নিজেদের উপলব্ধ সম্পদ আমাদের দিয়াছেন। বন মানবীয় বাসভূমির প্রান্তে (outskirt) জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের বাহিরে। শান্ত রসাস্পদ তপোবনেই ব্রহ্মতপস্যার যোগ্যস্থান। কিন্তু কি আশ্চর্য: সর্বশাস্ত্রের নির্যাস ব্রহ্মতত্ত্বময় গীতার আবির্ভাব জীবনের প্রান্তে নহে, সংগ্রামময় জীবনের কেন্দ্রস্থলে। ভীমনযুদ্ধের শঙ্খ দুন্দুভিনিনাদ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে গীতার প্রশান্ত সঙ্গীত ঝঙ্কার। 'মধ্যে মহাভারতম্।'

মহাভারত নামক বিরাট দেবভূমির যে অখন্ড সংস্কৃতি — তাহারও নাম মহাভারত। এই সংস্কৃতি বহুমুখী। বিশালবটবৃক্ষের মত অসংখ্যশাখাপল্লব। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, কথা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যষ্টি-সমষ্টির জীবননীতি, বর্ন, আশ্রম, শিক্ষা, ক্রীড়াজীবনের এমন কোন দিক নাই যেদিকে আর্যঋষির মনীষা প্রকাশিত হয় নাই। এই বহুমুখী সংস্কৃতির মধ্যে একটি অখন্ডতা আছে। ইওরোপের সভ্যতা বহুমুখী, কিন্তু একতার বন্ধন নাই। এই বিরাট উপমহাদেশের বহুবৈচিত্র্য-ময় ভাবভাষা ও জীবনযাত্রার মধ্যে এক অপূর্ব একত্ব বিদ্যমান। বহুবিধ পুষ্পকে যেমন সূত্রে

একত্রীভূত করিয়া মালিকায় পরিণত করে, মহাভারত বহুমুখী সংস্কৃতিকেও সেইরূপ অখণ্ডরূপ দিয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু দর্শনেই ঋষি মনীষীর চরমফল প্রকাশিত। এই তন্ত্রের অনবদ্যরূপায়ণ সমস্ত আর্যসংস্কৃতিই গীতা কেন্দ্রিক—"সূত্রে মণিগনা ইব।"

বহু সংস্কৃতির ধারক বাহক ও পোষক শ্রীগীতার সূত্র। সূত্রের স্থান মালাখানির মধ্যেই "মধ্যে মহাভারতম্।" (২)

(গ)

প্রস্থানত্রয়কে বলা হয় ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। প্রস্থানত্রয় বলিতে কি বুঝায় ?

"প্রস্থানত্রয় বলিতে উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও গীতাকে বুঝায়। বস্তুত: উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র ও গীতাই আর্যঋষির মুখ্যশাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র হইতে প্রকাশিত সত্যেরই বিভিন্নমুখী অভিব্যক্তি। উপনিষদ, সূত্র ও গীতাতেও মূলত: একটি তত্ত্বেরই ত্রিমুখী বিকাশ। উপনিষদকে বলে শ্রুতি প্রস্থান ইহা অনাদি সত্য। কেহ রচনা করে নাই। গুরু শিষ্য পরম্পরা অনাদিকাল ধরিয়া শ্রুত হইয়া আসিতেছে। ইহা অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার।

গীতাকে বলে স্মৃতি প্রস্থান। শ্রুতির সত্যই মানবীয় জীবনস্মৃতির মধ্যে, লৌকিক ইতিহাসের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের সংবাদের মাধ্যমে প্রকটিত হইয়াছে স্মৃতিপ্রস্থান গীতা গ্রন্থে। বেদান্তসূত্রকে বলে ন্যায় প্রস্থান। শ্রুতি ও স্মৃতির সত্যই ইহাতে ন্যায়ানুমোদিতভাবে বাদবিচার ও তর্কের মাধ্যমে সুসিদ্ধান্তরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহা শ্রুত হইয়া আসিতেছে ঋষি - গুরু পরম্পরায়, ই দৃষ্ট হইয়াছে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের মধ্যস্থলে তাহাই পুনরায় যুক্তিমুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বেদান্ত দর্শনে।" (৩)

গীতা স্মৃতিপ্রস্থানরূপে গৃহীত মুখ্যত: মহাভারতের অংশরূপে। আবার গীতা সর্ব উপনিষদের সারস্বরূপ। সেইকারণে গীতাকে শ্রুতিপ্রস্থান হিসাবেও গ্রহণ করা যায়। বেদান্তসূত্রকে বলে ন্যায় প্রস্থান। কারণ বিভিন্ন বেদের ও উপনিষদের উক্তির মাধ্যমে যে সব অনৈক্য ও বিরোধিতা দৃষ্ট হয় ভগবান বাদরায়ন তীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। সদ্‌যুক্তি বলে —— বিরোধ মীমাংসা করিয়া

সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের নাম ন্যায়। শ্রীভগবান গীতার মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষে যতরকম সামাজিক আধ্যাত্মিক মতবাদ ও সাধন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। গ্রহণ - বর্জন - সংযোজন করিয়া কর্ম - জ্ঞান - ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। সব অনৈক্য এক পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। শরনাগতির লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া সমগ্র মনুষ্য সমাজের জন্য পরমোদার সার্বজনীন সরণি প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ববৈষম্যকে এক অদ্বৈত সাম্যে প্রতিষ্ঠা করে যাহা তাহা ন্যায় প্রস্থান। এই দিক হইতে গীতাকেও ন্যায় প্রস্থানও বলা যায় না কি ?

সুতরাং উক্ত যুক্তি ধাপ অনুসরণ করিয়া এক গীতা গ্রন্থের মধ্যেই যে শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় প্রস্থান — ভারতীয় বিচার পদ্ধতির প্রস্থানত্রয়ীর সন্ধান পাওয়া যায় — এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় না।

বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষীবৃন্দের মতে পৌরানিক যুগের প্রারম্ভকাল ২০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া বিবেচিত। এই পৌরাণিক যুগেও গীতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত গীতামাহাত্ম্য, গীতার অনুকরণে বহু নূতন নূতন গীতার রচনা আবার স্থল বিশেষে গীতারই সারাংশ পুরাণাদির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রাদিতে গীতা মাহাত্ম্য প্রকাশিত, শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষত: একাদশ অধ্যায়ে গীতার ভাবের প্রভাব সুব্যক্ত। অনুগীতা উত্তরগীতা প্রভৃতিতেও উক্ত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে উপনিষদের ভাব পরিচয়ার্থে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পৌরাণিক যুগেও গীতা সর্বমান্যা ছিলেন।

(ঘ)

গীতার বাণী সনাতনী, সকল দেশের সকল কালের সকল মতের মানুষের হৃদয়গ্রাহিনী। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে সকল ভাষায় গীতা গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, এবং সকল যুগের সকল কালের ভক্তিরস ও তত্ত্বপিপাসু জ্ঞানীগুণী মহাত্মাজনের কাছে বিশেষত: পুন্যভূমি ভারতবর্ষে এই মহাগ্রন্থ সমভাবে সমাদৃত। গীতার এই পরম শ্রেয় সার্বজনীন রূপটির অন্যতম প্রমাণ এই যে প্রাচীন আচার্যগণ গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমেই একটি বিশিষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে সর্বদাই গীতা ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। গীতার প্রধান প্রধান ভাষ্যকারের মধ্যে অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য ও শ্রী রামানুজাচার্য, প্রত্যভিজ্ঞাবাদী অভিনবগুপ্তাচার্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বকাচার্য দ্বৈতবাদী শ্রী মাধবাচার্য, রামানুজমতাবলম্বী বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য, শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি, মাধবাচার্যের ভাষ্যের টীকাকার জয়তীর্থাচার্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য, মহাভারতের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ সূরী, সমন্বয়বাদী বিজ্ঞানভিক্ষু প্রাচীন বাঙালী গীতা ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অদ্বৈতবাদের সমর্থক আচার্য মধুসূদন সরস্বতী, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (মতান্তরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী) অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্য শঙ্করের পূর্বতন বহু ভাষ্যকার গীতা ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের গুরু গৌড়পাদাচার্যের 'মাণ্ডুক্যকারিকা' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উল্লেখযোগ্য যে এই সম্বন্ধে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী স্বীয় গীতার ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (৪)

প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে প্রস্থানত্রয়ের টীকা না লিখিলে আচার্য হওয়া যাইত না।

নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা অনুশীলন ও সম্প্রসারণের জন্য ইহা অত্যাবশ্যক ছিল। সেই সূত্রেই পূর্বোক্ত আচার্যগণকে ভাষ্যরচনা করিতে হইয়াছে এবং তদনুবর্তী সূরিগণ টীকাটিপ্পনী দ্বারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধারা অবারিত ও অব্যাহত রাখিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকারগণ ছাড়াও বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত নিজ প্রতিভাবলে গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের অনেক টীকাকারও স্বতন্ত্রভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল ধর্মাচার্যগণ ও শাস্ত্রীমণ্ডলীই যে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নহে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আদর্শের সংঘাতে যে নব্য ভারত উজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি নবজাগ্রত জীবন বোধের দিক হইতে, আধুনিক জীবন সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ প্রেরণারূপে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তথা পার্থসারথীর নির্দেশকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে সশস্ত্র আন্দোলনের সমর্থক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রী অরবিন্দ এবং অহিংসা আন্দোলনের সংগঠক ও সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার ভাবশিষ্য আচার্য বিনোবাভাবে প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ জীবনাদর্শানুযায়ী গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর রাজত্বের জীবনাদর্শও উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাব প্রদেশে শিখ সম্প্রদায়ের প্রথম সংগঠক গুরু নানক এবং দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ — ইহাদের সকল প্রচার সাধনার তপস্যার মূলে গীতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় মনীষীবৃন্দের গীতা ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মসমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির গীতার প্রভাবাদি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আচার্যগণ এবং আধুনিক কালের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ গীতার উপর কত নব নব আলোকপাত করিয়াছেন তবু গীতার ব্যাখ্যা নব নব তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন আজও শেষ হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতার শাশ্বত চিরন্তন, অফুরন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য "ভাগবদগীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়ত কোনও কালেও পুরাতন হবে না।" (৫)

"আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে ভারতীয় ধর্মাচার্যগণের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও অভারতীয় পন্ডিতগণের গীতা পরিক্রমার পথরেখা সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইব, ইহাতে গীতার যে মহান উত্তরাধিকার ভারতীয় তথা বিশ্বজনের কাছে অবাধ হইয়াছে তাহা স্পষ্টতর হইবে।

অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন ——"যখন ভারতে বৌদ্ধমত ও বৈদিক কর্মমত প্রাধান্যের জন্য ব্যস্ত, পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান তখন আচার্য শংকর দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশে কালডি নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।" (৬)

শংকরের মনীষা ছিল অসাধারণ। এইরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। আচার্য শংকরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী শ্রীরঙ্গমের বাণী বিলাস প্রেস হইতে ১৯০০ খ্রী: প্রকাশিত হইয়াছে। ২০ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। একাদশ ও দ্বাদশখণ্ডে গীতাভাষ্য রহিয়াছে। গীতাভাষ্যের বহু সংকলন গ্রন্থ ও নানারূপে সংস্করণ হইয়াছে এবং হইয়া আসিতেছে দীর্ঘকাল হইতে যথা —— আনন্দ আশ্রমের সংস্করণ (১৮৯৭), নির্ণয় সাগর (আটটীকা) (১৯১২), বেঙ্কটেশ্বর (ছয়টীকা), কলিকাতায় ১টি টীকাযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় সংস্করণ (কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত) এবং Lotus Library সংস্করণ এখনও সুলভ। অবশ্য ইহা ছাড়াও আরও বহুবিধ সংস্করণ রহিয়াছে।

ভাষ্য অনুসরণ করিয়া টীকা গ্রন্থ রচনাও কম হয় নাই। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

১। গীতাভাষ্য বিবেচন — আনন্দগিরিকৃত
২। গূঢ়ার্থ দীপিকা — মধুসূদন সরস্বতীকৃত
৩। গীতা সুবোধিনী — শ্রীধরস্বামীকৃত
৪। গীতার্থ প্রকাশ (ভারত ভাবদীপ)—শ্রী নীলকণ্ঠ সূরী
৫। শঙ্করানন্দের টীকা—
৬। ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা — ধনপতি সূরিকৃত

কলিকাতায় "উৎসব" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় টীকা ও ভাষ্য হইতে সংগৃহীত টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যায় আচার্য শংকরের ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইংরেজী অনুবাদ (Sacred Books vol. VIII - A. 2nd Edn. Oxford 1918) হইয়াছে। ডেভিস সাহেবের এক অনুবাদও আছে তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৪ সাল এ প্রকাশিত হইয়াছিল। Oriental Series ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় করিয়াছেন।

শংকর নিষ্কামকর্মবাদী। তাঁহার মতে কেবল ঈশ্বরার্থ কর্মই নিষ্কাম কর্ম। কোনও আশা আকাঙ্খা নাই, কোন পিপাসা নাই, কেবল ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত। ইহাই নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা, জ্ঞান নিষ্ঠা হইতে জ্ঞানপ্রশক্তি এবং জ্ঞান প্রাপ্তিতে মোক্ষলাভ। গীতাভাষ্যে শংকর বলিতেছেন —

"অসত্তশ হি যস্মাৎ সমাচরণ্ ঈশ্বরার্থং কর্ম কুর্বন্
পরমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্তশুদ্ধিদ্বারেন ইত্য র্থঃ।" (৭)

সুতরাং শংকরের মতে ইহাই গীতার শিক্ষা। নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানলাভের উপকারক। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের লক্ষ্য। শংকরের মতে জ্ঞানের পক্ষে কর্মের কোনও আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি চলিয়া গেলে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকেনা। স্মৃতিও কর্মাভাব প্রদর্শন করে।

ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন —

"সর্বকর্মাণি মনসা সন্যস্য" ইতি। ৫।১৩

আরও বলিয়াছেন ——

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ৩।১৭

ইহার ভাষ্যে শংকর বলেন ——

"এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীর স্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি। ন তেষামাত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ব্যতিরেকেণান্যং কার্যমস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতি পিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্বন্নাহ ভগবান্ — যস্ত্বিতি।" অতএব শংকরের মত মতে জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় হইতে পারে না। " (৮)

"এই জ্ঞানের আবির্ভাবে যে মানুষের সকল কর্মত্যাগ হয় যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর যেকোন কর্ম থাকেনা, ব্রহ্মজ্ঞানরূপে অগ্নি যে মানুষের শুভাশুভ সকল কর্মকেই ভস্মীভূত করে এ সকল কথা শ্রীভগবান গীতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই জ্ঞান লাভের উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছেন :

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপর সংযতেন্দ্রিয় : ।" ৪।১

"যিনি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।" (১

পন্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন যে আচার্য শংকরানন্দের স্থিতিকাল চতুর্দশ শতাব্দী। তিনি আচার্য শংকরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদী আচার্য হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করায় ইহার অগাধ পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শংকরানন্দের গীতার টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই টীকা সহ গীতা পুণা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সরল ভাষায় ও সহজভাবে গীতার তাৎপর্য নির্ণয় করা হইয়াছে। যোগ সাধনের অনেক রহস্য অতি উত্তমরূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

আচার্য আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি ১৫শ শতাব্দীর লোক। তিনিও শংকর ভাষ্যের টীকাকার হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শাংকর দর্শনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি গীতার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে শিষ্যদিগের শিক্ষার জন্যই তিনি গীতাভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেন। এবং গীতার টীকার সমাপ্তি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে পূর্বতন আচার্যগণের পদবী অনুসরণ করিয়া গীতাভাষ্যের টীকা প্রণয়ণ করিলেন।

"প্রাপ্যাচার্য্য পাদানাং পদবীমনুগচ্ছতা।
গীতাভাষ্যে কৃতাটীকাটীকতাম্ পুরুষোত্তময়॥"

আনন্দগিরি বিরচিত গীতাভাষ্যের টীকা "গীতাভাষ্যবিবেচন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই টীকা নানা প্রকার সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও লোটাস লাইব্রেরী কলিকাতা, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই ও পুণা আনন্দাশ্রম হইতে আনন্দগিরির টীকা প্রকাশিত। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও আনন্দগিরির টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ষোড়শ শতকের নীলকণ্ঠসূরী মহাভারতের টীকাকার। মহারাষ্ট্রদেশে ইঁহার জন্ম। নীলকণ্ঠ অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গীতার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে তিনি নিজ ব্যাখ্যাকে সম্প্রদায়ানুমত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যায় কোনকোন স্থলে শাংকর ভাষ্য অতিক্রমও করিয়াছেন। ধনপতিসূরী তাঁহার ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকায় সেই সকল স্থল অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের গীতার টীকা অনেক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণেও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণে নীলকণ্ঠের টীকা দেওয়া হইয়াছে।

2 MAR 1982 77727

সপ্তদশ শতাব্দীতে অদ্বৈত মতের অন্যতম প্রধান আচার্য্য মধুসূদনের আবির্ভাবই স্মরণীয় ঘটনা। এই সময়ে "হিন্দী সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। নাভাজী ভক্তমাল তুলসীদাস— রামায়ণ বিহারী সৎসাইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্র কুলভূষণ শিবাজীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্র সাহিত্যেরও অভ্যুদয় হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস "দাসবোধ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। এই অল্প সময়ে দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধিত হইয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। সম্রাট সাজাহানের সময় পৃথিবীর মধ্যে সপ্তাশ্চর্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য্য তাজমহল নির্মিত হয়। অন্যদিকে এই সময়েই অদ্বৈতবাদের তাজমহল মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভার অপূর্ব স্ফূর্ত্তিস্বরূপ অদ্বৈতসিদ্ধি বিরচিত।"(১০)

আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর জন্মস্থান বঙ্গদেশে কোটালীপাড়া পরগণায়। মধুসূদন বহুবিধ টীকা ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়া বাঙলার সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচিত গীতার টীকা "গূঢ়ার্থ দীপিকা" নামে খ্যাত।

"গূঢ়ার্থ দীপিকা"——"গীতার ব্যাখ্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন কি ইহাতে চ বা তু প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলিরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু স্থল বিশেষে মধুসূদন শাংকরভাষ্য অতিক্রম করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য সেই সকল স্থল ধনপতিসূরী তৎকৃত ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকায় উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করতঃ শাংকর ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদনের ব্যাখ্যা একটু ভক্তিবাদের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।" (১১)

অদ্বৈতসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ আচার্য হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরতত্ত্ব আর কেহ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তাঁহার রচিত বিখ্যাত শ্লোকটি —

বংশী বিভূষিত করাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুন — বিম্ব - ফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ইহার বাঙলা তর্জমা করিয়াছেন —

বংশীকর - পীতাম্বর - বারিদ - বরণ,
বিম্বাধর - মনোহর - নলিন - নয়ন।
চন্দ্রমুখ - চিত -সুখ গোপীচিত - চোর।
কৃষ্ণ হতে পর - তত্ত্ব জ্ঞাত নহে মোর ॥ (১২)

মধুসূদনের গূঢ়ার্থ দীপিকা গীতার নানাবিধ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর সংস্করণ প্রভৃতিতে এই টীকা আছে। নির্ণয় সাগরের ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের গীতার সংস্করণে অন্য সাতটি টীকাসহ গূঢ়ার্থ দীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ সুন্দর এবং সর্বোৎকৃষ্ট। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের পাঁচটি টীকাসহ গীতার সংস্করণেও মধুসূদনের টীকা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও কেবল মধুসূদনী টীকা সহ গীতার সংস্করণও সুলভ। মোটকথা মধুসূদনের টীকার আদর সর্বত্র।

(চ)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য নাথমুনির পৌত্র রামানুজাচার্যের গুরু যামুনাচার্য বীরনারায়ণপুর বা মাদুরাই এ ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শেষ জীবনে যামুনাচার্য সংস্কৃতভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন তাহার মধ্যে "গীতার্থ সংগ্রহ" অন্যতম। ইহা গীতার টীকা। কলিকাতায় পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণে এই টীকা সংযুক্ত হইয়াছে। গীতার্থ সংগ্রহে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রদর্শিত। যামুনাচার্যের প্রিয় শিষ্য ও উত্তর সাধক রামানুজ কেবল জীবনে নহে, ভাষ্যাদিব্যাপারে গুরু যামুনাচার্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। রামানুজের গীতায় ভক্তিবাদের প্রাধান্য যামুনাচার্যের প্রভাবের স্বাভাবিক পরিণতি ও বিকাশ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মুখ্য প্রচারক আচার্য রামানুজ। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কেশবভট্ট। তামিল প্রদেশে শ্রীপেরেম্বদুর তাঁহার বাসস্থান ছিল। রামানুজের মাতুল শৈলপূর্ণ তাঁহার নাম রাখিলেন লক্ষ্মণ বা রামানুজ। তামিল ভাষায় ইহার নাম ইলায়াপেরুমল।

রামানুজ প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভগবদ্গীতার ভাষ্য অন্যতম। সভাষ্য গীতা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। গীতাভাষ্যের উপরে বেদান্তাচার্যের টীকা। বেদান্তাচার্যের টীকা সহিত গীতাভাষ্য শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত টীকার নাম "তাৎপর্যচন্দ্রিকা।" এই গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই।

রাও বাহাদুর এম্ রঙ্গচারিয়া এম্.এ. মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক। কলিকাতার দামোদর মুখোপাধ্যায় গীতার সংস্করণে রামানুজ ভাষ্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ গীতাভাষ্যেও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শংকরের মতে জ্ঞানে মুক্তি। জ্ঞানই সাক্ষাৎ সাধনা। আচার্য রামানুজের মতে ধ্যান উপাসনাদিই মুক্তির সাধন। জ্ঞান মুক্তির সাধন নহে। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। সুতরাং তাঁহার গীতাভাষ্যে ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে রামানুজ যে বীজ বপন করিয়াছেন, বেদান্তাচার্য তাহাকেই ফল পুষ্পোপশোভিত মহামহীরুহরূপে পরিণত করেন। বেদান্তদেশিক বিশিষ্টাদ্বৈতক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান আচার্য। বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ কাঞ্জীর উপকণ্ঠে থাপ্পিল নামক পল্লীতে ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাবাদ আক্রমন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন রামানুজ। শ্রীরামানুজের লিখিত গ্রন্থাদি বেদান্তাচার্যের নিকট বড়ই আদরের বস্তু ছিল। শ্রীরামানুজের গীতাভাষ্যের উপরে "তাৎপর্যচন্দ্রিকা" নামক টীকা তিনি প্রণয়ণ করেন। সভাষ্য এই টীকা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। রাও বাহাদুর এম.রঙ্গচারিয়ার এম.এ. মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক।

(ছ)

দ্বাদশ শতকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উদ্ভব। উত্তরকালে শ্রী নিম্বার্কাচার্য স্বয়ং বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার মত বিশেষত: মথুরা অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশেও নিম্বার্ক মতের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসক। তাঁহার রচিত "গীতাবাক্যার্থ" আধুনিককালে দুষ্প্রাপ্য। নিম্বার্কাচার্যের দৃষ্টিতে গীতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন —

"তিনি বেদান্তপারিজাতসৌরভ নামে ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ণ করেন তার আলোকে আমরা গীতাবাক্যার্থের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুমান করিতে পারি। আচার্য নিম্বার্কের মতে গীতার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে। গীতার মতে জীব ও ভগবান ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। জীবও জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়। ব্রহ্ম মণ্ডল, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি অনন্ত কল্যান গুনোপেত। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জীব ব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তিরূপ অংশ, জগতের সঙ্গেও তাঁর ভেদাভেদ সম্পর্ক রয়েছে। মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মে লীন হন না। মুক্ত জীবের সঙ্গেও ব্রহ্মের ভেদ সম্পর্ক থাকে। ধ্যানসমাহিত শুদ্ধ মনে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তি প্রপত্তি (শরনাগতি) ও আত্মসমর্পন ভিন্ন মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না —— এই হল গীতার সংক্ষিপ্ত সার।" (১৩)

(জ)

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তুলবদেশের অন্তঃপাতী পজাকা ভূভাগে বেল্লিগ্রামে মধ্বাচার্যের জন্ম হয়। নাথমুনি যামুনাচার্য ও রামানুজাচার্যের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবমত যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ সচেষ্ট এই সময়েই মধ্বাচার্যের আবির্ভাব। দাক্ষিণাত্যে কর্নাটভূমিতে মাধব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং স্বয়ং মধ্ব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। "গীতাভাষ্য" ও "গীতাতাৎপর্যনির্ণয়" এই দুইখানি গীতার ব্যাখ্যা মধ্বাচার্য কর্তৃক বিরচিত। "গীতাভাষ্য" মধুবিলাস বুক ডিপোর সংস্করণে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীই প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাভাষ্য গদ্যে লিখিত। ইহা মধ্বসিদ্ধান্ত অনুসারে গীতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও এম.এ. মহোদয় মধবাচার্যের গীতাভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছে। "গীতা তাৎপর্যনির্ণয় প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার উপরে জয়তীর্থ স্বামীর "ন্যায়দীপিকা" নামক টীকা আছে। গীতাভাষ্য ও তাৎপর্য নির্ণয় উভয়ই গীতাভিত্তিক প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও উভয় রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও নূতনত্ব রহিয়াছে।

তিনি গীতার ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ভক্তিই মুক্তির উপায়— এ বিষয়ে মধ্ব ও রামানুজ একমত।

আচার্য জয়তীর্থ মধবাচার্যের ভাষ্যের টীকাকার। তাঁহার নাম ন্যায় দীপিকা। মধবাচার্য গীতার দুইটি ভাষ্য রচনা করেন— প্রথমটি "গীতাভাষ্য" অপরটি "গীতাতাৎপর্য নির্ণয়।" "ন্যায় দীপিকা"— মধবাচার্যের "তাৎপর্য নির্ণয়" নামক গীতাভাষ্যের টীকা। এই টীকার উপর "তাত্পর্যনীয়" নামক বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক "ন্যায়দীপিকা" মধ্ববিলাস বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাঘবেন্দ্রস্বামী জয়তীর্থাচার্যের টীকার বৃত্তিকার। রাঘবেন্দ্র মধ্বাবলম্বী। টীকা ও বৃত্তি রচনায় রাঘবেন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে "গীতাবিবৃতি" অন্যতম। "গীতাবিবৃতি" ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঝ)

ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রৈলিঙ্গদেশে শ্রীমৎ বল্লভাচার্যের জন্ম। চারিপ্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র, সম্প্রদায় অন্যতম। শ্রীমদ্ আচার্যবল্লভ ইহার মুখ্য প্রবর্তক। এই সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জীব মোক্ষলাভ করিতে পারে। ঈশ্বরের এই অনুগ্রহকে বলা হয় পুষ্টি বা পোষন। সেইহেতু এই সম্প্রদায়কে পুষ্টিমার্গও বলা হয়।

(ঞ)

প্রত্যক্ষবাদী অভিনব গুপ্তাচার্য একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গীতাভাষ্য হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে তিনি গীতাভাষ্য প্রণয়ন করেন। " স দ্বিজলোককৃত চোদনাবশতঃ গীতার তাৎপর্য নির্ণয় করেন তিনি।

তাঁহার নিজস্ব উক্তি—

"কৃতমিদং বান্ধবাচার্য্য হি" অর্থাৎ বান্ধবগণের জন্য ই তিনি গীতার্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা তিনি বার বার বুঝাইয়াছেন। পান্ডিত্যের সহিত ভগবভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁহার গীতাভাষ্য অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে।

এমনকি ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ফলেই গীতার্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাও বলিয়াছেন—"কৃতিশ্চেয়ং পরমেশ্বরচিন্তানন্দবিদ্যত্ত্বসাক্ষাৎকারাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদানাম্" অভিন্ন উপাসনার বা অহং গ্রহ উপাসনার ভাব তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট। গীতার সমাপ্তি শ্লোকে শিবের সহিত অভিন্ন ভাবের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন।

'অভিনবরূপাশক্তিস্তদ্গুপ্তো যো মহেশ্বরো দেবঃ
তদুভয়যামলরূপং অভিনবগুপ্তং শিবং বন্দে।' সাধনার ফলে অভিনব যে শিবে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন—ইহা তাহারই নিদর্শন।" (১৪)

(ট)

সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু। সাংখ্যানুকূল বেদান্তবাদ প্রচার করেন। বেদান্তের বিজ্ঞানমতে ভাষ্য উপনিষদের ভাষ্য, গীতার ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থও প্রণয়ণ করেন। তবে বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত গীতার ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না।

(৮)

ইতিপূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যেসকল টীকাকার ও ভাষ্যকারের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা এক মধুসূদন সরস্বতী বাদে প্রায় সকলেই বাঙলার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গীতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাংক অনুসরণ করিয়া যেসকল টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পর আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের দর্শনকে ভিত্তি করিয়া আধুনিককালে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী গীতার উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। এইসকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে গীতার সারতত্ত্ব তুলিয়া ধরা হইল।

দার্শনিকের বিচারে পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল বেদান্তের সুগভীর জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তিবাদের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। পাঞ্জাব প্রদেশে গুরু নানক ও যুক্তপ্রদেশে কবীরের আবির্ভাবে সমন্বয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে ভক্তির প্লাবন আসিয়াছে। এমন সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভক্তির উচ্ছ্বাসকে প্রবলতর করিয়া বঙ্গদেশ ভাসাইয়া লইয়া চলিল। রাগানুগা প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার কথা —— ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তুলিয়া ধরিয়াছেন——

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্থ বা প্রতিপাদ্য বস্তুর কথা প্রসঙ্গে দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে অশুদ্ধ গীতাপাঠী বিপ্রের কথোপকথনটি মনে জাগিয়া উঠে,———

"মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে, মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হইয়া রশ্মিধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়ো তাবৎ পাঁও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে, গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।"

এই রূপটির মধ্যে গীতা শাস্ত্রের অর্থসার অন্তর্নিহিত। (১৫)

এই রূপটিকে বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় গীতার মূল কথা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অব্যভিচারিনী ভক্তি ও শরনাগতি। অব্যভিচারিনী ভক্তিরই আপর নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীভগবান রসস্বরূপে "রস বৈ সঃ।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রস আশ্রয় করিয়াই ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভজনা করেন। জীব ভগবানের অংশ—

'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫।৭)

যাহাকে আমরা মায়া বলি তাহা হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।' (গীতা - ৭।১৪)

এই মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণ বিস্মরণ ঘটে। আমরা ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন সনাতনকে —

"কৃষ্ণ ভুলি জীব সব অনাদি বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥" (১৬)

কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের শরনাগত, তাহারাই মায়া সাগর হইতে উত্তীর্ণ হন। মাধুর্যঘন শ্রীভগবানের স্মরণ মননই হইতেছে সাধন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহামহোপাধ্যায়ের ১৫৭৬ শকে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি থানার অধীন দেবগ্রামে জন্ম হয়। তাঁহার রচিত "সারার্থ বর্ষিনী" নামক গীতার টীকা আছে। এই গীতার টীকা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে সংগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইনি একজন দিকপাল ছিলেন।

উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার রেমুনার নিকটবর্তী কোন গ্রামে বলদেবের জন্ম হয় অনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন তাহার মধ্যে "গীতাভূষণভাষ্য"—অন্যতম। তাঁহার নির্ণয় শ্রদ্ধালু জীবগণকে অবিদ্যারূপ ব্যাঘ্রীর বদন হইতে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে অর্জুনের মোহোপনোদনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের আত্মতত্ত্ব নিরূপিকা হয় এই গীতা।" (১৭)

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই ভাষ্যের উপর বাঙ্গালার এক বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যসহ গীতা রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৃক্ষ মহাশয়ের সম্পাদনায় ৪০৬ চৈতন্যাব্দে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও "গীতাভূষণ" নামক গীতার ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন আচার্যদের মধ্যে শ্রীধরস্বামীর নাম না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। ইনি গুজরাট দেশীয় এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। গীতার টীকার নাম সুবোধিনী। আর একটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায় গীতাসারটীকা। মূলে ব্রহ্মসেবাধনী।

শ্রীধর সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সর্বলোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥

সুতরাং শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীধর আনুগত্যেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(ঙ)

এবার অসাম্প্রদায়িক ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। লোকমান্য তিলকের মতে গীতার যে বিশিষ্ট যোগধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা জ্ঞান ভক্তি মিশ্র কর্মযোগ। এই কর্মযোগের রহস্য উদ্ঘাটনে লোকমান্য তিলকের গীতারহস্য এক অপূর্ব গ্রন্থ।

গীতা রহস্যের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :

"গীতারহস্যের এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া এই রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যের দিনে যদি কাহারও স্থিতপ্রজ্ঞালাভ হয় যদি কাহারও অন্তরে অচলা ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয় তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।" (২০)

গীতা সম্পর্কে তিলকের সুস্পষ্ট অভিমতটি এইখানে উল্লেখযোগ্য —

"সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধরূপে আধুনিক হিন্দুধর্মের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গীতার তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেই নাই।" (২১)

আবার অন্যত্র বলিতেছেন : "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নির্মল হীরকখণ্ড। গীতার ন্যায় এমন সরল দ্বিতীয় গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন জগতের সাহিত্যেও দুর্লভ।" (২২)

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একখানি গীতাভাষ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যুর পূর্বে ভাষ্যটিকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রাচীন পণ্ডিতদের গীতার যত ভাষ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্র সবগুলি নিপুনভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সবগুলি আলোচনা করিয়া তিনি মনে করিতেন যে আধুনিক মনের সকল সংশয় প্রাচীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যসমূহ নিরসন করিতে সক্ষম নহে। এইজন্য ই তিনি বাঙলাভাষায় গীতাভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত বাঙালী পাঠকের কথা মনে রাখিয়াই তিনি আধুনিক চিন্তার আলোকে গীতার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না। তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তীক্ষ্ণ। তাঁহার রচিত ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত, বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর দার্শনিকতার নিদর্শন। তাঁহার উপন্যাস আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থত্রয় নিপুন দার্শনিকতা ও সরস সাহিত্যের অপূর্ব সংমিশ্রন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা মনুষ্যত্বলাভে। সম্যক মনুষ্যত্ব লাভ করা ও ধার্মিক হওয়া একই কথা। ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে তিনি অভিন্ন মনে করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় —— শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিনী ও চিত্তরঞ্জিনী এই সকল বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্যই ধর্ম। এই ধর্মলাভই পূর্নমানবতা লাভ। মানুষের বুদ্ধি যখন ঈশ্বরমুখী তখনই তাহার নাম জ্ঞান। মানুষের চিত্তের আবেগগুলি যখন তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায় তখন তাঁহার নাম ভক্তি। মানুষের সকল প্রকার কার্য যখন ঈশ্বর প্রীত্যর্থে হয় তখন তাহার নাম কর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে ভগবদ্গীতা জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করিয়া মানব জাতির প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

গীতার এই সমন্বয়ের তুলনা বঙ্কিমপূর্ব আর কোন ধর্মগ্রন্থে আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

নববিধান সমাজের স্থাপয়িতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নির্দেশে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় গীতার "সমন্বয়ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। উক্ত ভাষ্যখানি নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' অতি সুযুক্তিপূর্ণ ছোট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অভিনবত্ব হইল গুণত্রয়ের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে তিনটি গুনের আলোচনায় গীতার মূল কথা। রজঃ, তমঃ গুনের বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্ত্বগুন লাভই জীবনের পূর্ণতা।

হিন্দুসমাজের চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের বৃত্তিমূলে সত্ত্ব রজস্তম এই তিনটি গুন। এই তিনটি গুনের স্বরূপ কি? তিনটি গুন কীভাবে সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। কীভাবে রজগুন তমের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুনের অধিকারী হওয়া যায় তাহা অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা গীতাপাঠ গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গী ও ঐ দৃষ্টান্ত সমাবেশ অননুকরনীয়। মানুষকে সত্ত্বগুনে স্থিত করাই গীতার লক্ষ্য। ইহাকে মানবজীবনে বাস্তবসত্য গীতাপাঠ গ্রন্থে ইহা দেখান হইয়াছে। দৃষ্টির উদারতা ও বিশ্লেষণের গভীরতা দুয়ের মিলনে গীতাপাঠ গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক।

বেদান্তজ্ঞ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ গীতায় ঈশ্বরবাদ। ইহা একখানি বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ। ঈশ্বরবাদ শব্দের অর্থ পাশ্চাত্য দর্শনে
ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র সৃষ্টিরহস্য বা জীবনরহস্যকে জানাই এর লক্ষ্য।

গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রন্থে দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্ব মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্দর্শনের কোন দর্শনেই কেন্দ্রস্থ তত্ত্ব ঈশ্বর নহেন। জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি নহে। একমাত্র গীতারই কেন্দ্রস্থলে পুরুম পুরুষোত্তম ভগবান ও মানব জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও তাহার উপায় ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পন।

হীরেন দত্ত লিখিয়াছেন তিনি যখন বয়সে তরুণ তখন একদিন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে গীতায় নিষ্কাম কর্ম আত্মজ্ঞানলাভ ও নির্মল ভক্তির ঊর্ধ্বে সমন্বয়স্থাপন করিয়াছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভূতি হীরেন দত্ত মহাশয়ের গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রন্থে সুন্দররূপে রূপায়িত হইয়াছে।

বোমার মামলায় বিচারাধীন আসামী শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে ক্ষুদ্র সেলে বন্দী ছিলেন। ইহাতে তাঁহার শাপে বর হইল। নির্জন কারাকক্ষে গভীর তপস্যায় মগ্ন হইয়া তিনি বাসুদেবের দর্শন পাইলেন। বাসুদেবম্ সর্বম, গীতার এই শ্লোক তাঁহার জীবনে মূর্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির ফলে তিনি শ্রীভগবানের

মুখ নি:সৃত গীতার মর্মবাণী তাঁহার Essays on The Gita গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রী অরবিন্দ বলিয়াছেন গীতার শিক্ষার সার পুরুষোত্তমযোগে। পুরুষোত্তমের সহিত একাত্মতার উপলব্ধিতেই দিব্যজীবন লাভ হয়। গীতার মধ্যেই সকল প্রকার সাধনার সমন্বয় দেখিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন পূর্ণযোগ। তাঁহার মতে এই পূর্ণযোগই জীবনের লক্ষ্য।

প্রথম জীবনে শ্রী অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী। তাঁহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত শতশত প্রভাবান্বিত অগণিত বিপ্লবী যুবক গীতা হইতে কর্ম প্রেরনা লাভ করিতেন। 'যানন্স্মর যুধ্য চ' গীতার এই বাণী ছিল ইংরাজের বিরুদ্ধ সংগ্রামের ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মত্যাগের মূল উৎস ছিল গীতোক্ত আদর্শ—আত্মা অবিনশ্বর। জীর্ন বস্ত্র ছাড়িয়া মানুষ যেরূপ নূতন বস্ত্র পড়ে সেইরূপ নিজের আত্মাও পুরাতন দেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ ধারণ করে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে বিপ্লবীগণ নির্ভয়ে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীজীকে জাতির জনক বলা হয়। ভারতের চল্লিশকোটি নরনারী একটি জাতি——এই রাজনৈতিক অনুভূতি মহাত্মা গান্ধী এই যুগের জাতির মনে জাগ্রত করেন। ইংরেজ রাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই যে তৎকালীন ভারতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য——জাতীয় জীবনে এই অনুভূতিও গান্ধীজীর দান।

গান্ধীজীর বিরাট জীবনের ভিত্তি গীতা। যদিও তিনি গীতাকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন না তথাপি গীতার শিক্ষা তাঁহার জীবনে নিগূঢ়। গান্ধীজী বলেন —— কুরুক্ষেত্র আমাদের হৃদয়ক্ষেত্র। ইহা দৈবী ও আসুরীবৃত্তিসমূহের যুদ্ধক্ষেত্র। গান্ধীজীর মতে গীতা মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে শিক্ষা দিয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার উপায় অনাসক্তি যোগ। যিনি মনে প্রাণে অহিংস সর্বকর্মে সত্যাশ্রয়ী তিনি অনাসক্ত হইতে পারেন। এই জন্যই অসত্যের সঙ্গে অসহযোগ অহিংসাবর্জিত হইয়া স্বাধীনতা লাভের সাধনায় গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের মূল কথা।

এই আদর্শবাদ তিনি গীতার প্রত্যেকটি মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাইতেন। গান্ধীজী বলিতেন —"আমার দুইটি জননী — একজন গর্ভধারিনী ও অন্যজন গীতা। সন্তান যেমন জীবন যাপনে জননীর স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় করে জীবনের সকলপ্রকার সমস্যা সমাধানে দুই জননীর নিকট হইতেই নির্দেশ পাইয়াছি। তবে গর্ভধারিনী জননীকে সর্বদা কাছে পাই না। এখন তিনি স্বর্গগতা হইয়াছেন, কিন্তু গীতা জননীর নির্দেশ হইতে কোনদিন বঞ্চিত হই নাই। তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া আমি সর্বদাই জয়যুক্ত হইয়াছি।"

অহিংসা ও সত্যের মূল প্রেরনা তিনি গীতা হইতে লাভ করিয়াছেন। গীতা শিক্ষার প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধাভক্তি তৎকালীন অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে গীতামুখী করিয়াছিল। গান্ধীজী প্রতিদিন প্রার্থনা সভা করিতেন। তাহাতে গীতা ও কোরান দুই গ্রন্থই পাঠ হইত। দুইএর মূল সত্য যে এক ইহা প্রতিটি ভাষণে বুঝাইয়া দিতেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ঐক্য আনয়ন করাই তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধনা ছিল।

গান্ধীজীর গীতা ও কোরাণের সমন্বয় দৃষ্টি আজিও ভারতীয় নরনারী জীবনের কল্যান আনয়নে সহায়তা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসকল ধর্মসমাজের আবির্ভাব ঘটে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি অন্যতম। এই সকল ধর্মসমাজের উপর গীতার প্রভাব লক্ষণীয়।

ব্রাহ্মমতে নিরাকার ব্রহ্মই উপাস্য। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক। তিনি বিশেষত: উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের সার গীতা। তাহা ছাড়া স্মৃতি প্রস্থানের সমস্ত প্রমাণ তিনি গীতা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রামমোহনের জীবনের উপর গীতার স্থায়ী প্রভাব অপরিসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি আকর্ষণীয় দিক হইল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির (Theosophical Society) আবির্ভাব। মাদাম ব্লাভাৎস্কি নামক একজন বিদুষী রাশিয়ান মহিলা ও কর্নেল অলকট নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। অ্যানি বেসান্ত থিয়োসফিক্যাল সম্প্রদায়ের নেত্রীরূপে ভারতে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। আমেরিকায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির বিশেষ প্রভাব। সেখানকার থিয়োসফিস্টরা গীতাকেই তাঁহাদের বাইবেল মনে করেন। মাদ্রাজে আডিয়ার নামক সহরে ভারতীয় থিয়োজসফিস্টদের প্রধান কার্যালয়।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মূল লক্ষ্য হইল সকল ধর্মমতের সমন্বয় সাধন। এই সম্প্রদায়ের উক্ত প্রচেষ্টা যেন গীতার বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' থিয়সফিক্যাল সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ভগবানদাস বিরচিত Studies in The vagvad Gita নামক প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য থিয়সফির নিয়ম অনুসারে নির্নীত হইয়াছে। অ্যানিবেসান্তের গীতার একটি চমৎকার অনুবাদ আছে মটনবাহারী জিনহ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

(চ)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসকল মনীষী ভারতে আগমন করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া গীতা অনুবাদ করেন তাঁহাদের মধ্যে চার্লস উইলকিন্স (Charles willkins), গার্বে (Garbe), অ্যানি বেসান্ত (Annie Beasant) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চার্লস উইলকিন্স (Charles willKins) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অবশেষে তিনি ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় (London 1785; calcutta 1902)। যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে ইহা গীতার সর্বপ্রথম অনুবাদ। ইংরেজী গদ্যে অনূদিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়ারেন হেষ্টিংস মন্তব্য করিয়াছেন "মিল্টনের কাব্যের চেয়েও মহত্তর ভাষায় গীতা গ্রন্থে পরমাত্মার ভজনা করা হইয়াছে।" ভগবদ্গীতার এই অনুবাদ পরবর্তীকালে জার্মানী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়।

গার্বে (Garbe) সাহেব গীতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ৬।৭ বার গীতা পড়িয়াছেন। ভূমিকায় তিনি সাংখ্য দর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যদিও এই ভূমিকায় তিনি পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই তবুও তাঁহার গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার্হ। এই ভূমিকা Bhandarkar Reserch Institute হইতে প্রাকশিত হইয়াছে।

অ্যানি বেসেন্টের গীতা এবং এডুইন আর্নল্ডের The Song Celestial কাউ ত্রিস্টোফার ঈশার উডের গদ্য - পদ্যে অনূদিত গীতার সংস্করণটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রুশ ভাষায় প্রথম গীতার অনুবাদ করেন নভিকভ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ল্যাটিন ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্লেগেল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন ইউজো বুর্ণুয়া। গ্রীক ভাষায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জোমোট্রিয়া, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় ভন.এফ.লরিন্সর। ইহা ছাড়াও এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছে এবং কোন কোন ভাষায় একাধিক অনুবাদ হইয়াছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী ফার্সী ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন। মোগলযুগে আরবী ও ফারসীতে আরও অনুবাদ হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ইংরাজী অনুবাদকগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রী অরবিন্দের কথাও এই প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে স্মর্তব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কে.টি.তেলাঙ্গ এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ইহা The Sacred Books of The East Series এ প্রকাশিত হয়।

(গ)

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে ও উপাসনা পদ্ধতিতেই এক ধরণের সঙ্কীর্নতা আছে। "আমার পথ ছাড়া মুক্তিলাভের ও শান্তিলাভের আর অন্য কোন পথ নাই"— এমন একটা ধারণায় অনেক ধর্মমতে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে এই সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ খুব সম্ভবতঃ ভগবদ্গীতার শিক্ষা। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি সেইভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করি। এই বাণীর প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় 'যতমত ততপথ'— এই বাক্যে পাওয়া যায়।

এই বিশ্বাস প্রত্যেক হিন্দু-হৃদয়ে সুদৃঢ় যে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যেকোন পথ অবলম্বন করিলেই ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ হয় ও জীবনে পরিপূর্ণতা আসে।

ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন চিরকালই ত্যাগধর্মের উপর স্থাপিত ছিল। একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের মধ্যে ছিল ত্যাগ। সমাজ জীবনে বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সামগ্রিক কল্যান সাধনাই ছিল লক্ষ্য। বর্নাশ্রম ধর্মের ভিত্তিও ত্যাগের মন্ত্রে সমুজ্জ্বল।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজের উন্নতির মূলে ছিল ব্রাহ্মনের ত্যাগ। নিজ জীবনের ক্ষুদ্র প্রয়োজন ভুলিয়া সমাজ জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ছিল ব্রাহ্মনের কর্মে। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা এ সকলের মূলে ছিল ত্যাগ। বিদ্যাদান করিয়া অর্থগ্রহণ ব্রাহ্মন পন্ডিত পাপ বলিয়া মনে করিতেন। আপনার প্রয়োজন ভুলিয়া সমাজকে বিদ্যাদান ইহাও একটি নিত্য কর্ত্তব্য। সমাজ কল্যানের জন্য আত্মাহুতি ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম। এই সকল কর্মের মূলে ছিল গীতার শিক্ষা।

প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্মের দ্বারা সমাজের সেবা হইতেছে। তাহার দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইতেছে—এই বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান কর। ইহাই গীতার শিক্ষা—

'স্বকর্মনাতমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'।

যদিও এই শিক্ষা হইতে ভারতীয় জীবন বিচ্যুতির পথে চলিয়াছে তথাপি সেবাবুদ্ধিতে কর্মাচরণ এখনও ভারতীয় নরনারীর জীবন আদর্শের মূলে বিদ্যমান আছে। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের শিক্ষার মূলে এই ত্যাগভিত্তিক সেবাধর্ম বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, তুলসীদাস, তুকারাম, শ্রীচৈতন্য - নিত্যানন্দ, রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ, গান্ধীজী - অরবিন্দ প্রমুখ সকল মনীষিগণই এই ধর্মের মহিমা শিক্ষা দিয়াছেন।

এই ত্যাগধর্মের ভিত্তি গীতা। সুপ্রাচীন যুগে উপনিষদ বলিয়াছেন—'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্ব মানশু' একমাত্র ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। আর অধুনাকালে প্রভু যীশুখৃষ্ট জগদ্বন্ধু সুন্দর বলিয়াছেন—'ত্যাগই সুখ।' ত্যাগের এই মহিমা ভারত গীতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দন্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি হয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

(৩)

জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু কিছু শিক্ষা ও উপদেশ আছে যাহা সম্প্রদায়ভিত্তিক, আবার কিছু কিছু আছে যাহার ভিত্তি সর্বমানবীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সার্বজনীন শিক্ষাও সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার একমাত্র ও একক ব্যতিক্রম শ্রীমদ্ভগবদগীতা। কারণ একমাত্র গীতা গ্রন্থই কোন প্রচার সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শশূন্য হইয়া বিশ্বমানবের ধর্মপ্রচার করিয়াছে। সর্বনীতিতে সাম্যদৃষ্টি, সর্বভূতহিতার্থ সকল কর্মানুষ্ঠান সর্বপ্রকার কামনাশূন্য হইয়া আত্মস্থ বর্জিত হইয়া বিশ্বকল্যাণে আত্মনিয়োগের আদর্শ গীতাই শিক্ষা দিয়াছে। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি মহাগ্রন্থ সংশয় নাই। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এবং তাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রসার, প্রতিষ্ঠার জন্য স্বধর্ম সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কত যুদ্ধ, রক্তপাত, অশান্তির বিপ্লবে বার বার পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে, কিন্তু গীতা গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া কোন সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ গীতার ভগবান বলেন জগতে যে কেহ যাহা খুসি দিয়া, যেনামে ও মন্ত্রে যাহাকেই পূজা করুক সমস্ত নদী-খাল খাতবাহী জলধারা গিয়া যেমন এক সমুদ্রে পতিত হয় তেমনি সব পূজাই এক ঈশ্বরে নিবেদিত হয়। তাহা হইলে আর ধর্মে ধর্মে উপাসনা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদের আর অবকাশ কোথায়? তাই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহা বিশ্বমানধর্মের মহাগ্রন্থরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। এবং বিশ্বমানবের ধর্মগ্রন্থ দিনের পর দিন পৃথিবীর সর্বত্র গীতার আদর বাড়িতেছে। গীতা পাঠ করিয়া পৃথিবীর মনীষীবৃন্দ গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অসাম্প্রদায়িকত্ব সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন, ভারতীয় কবিকণ্ঠে তাহার রূপ এই প্রকার—

বিশ্বধর্ম বিশ্বপ্রেম বিশ্বমানবতা।
কে শেখাল জগতেরে তবে ভারতের গীতা॥

গীতা কোন দল বা সম্প্রদায় গঠন করেন নাই, কিন্তু বিশ্বমানবধর্মের ধারক। গীতার সমাদর ও প্রচার বাড়িতেছে এই আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ড: মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর একটি অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন ও মন্তব্য একটু বিস্তৃত হইলেও উদ্ধার করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন —

"নিউইয়র্ক স্টেটের একটা শহর। বক্তৃতা করিতে গিয়াছি। ট্রেনে পৌঁছিয়া গিয়াছি বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ পূর্বে। বসিয়া আছি একাকী, লোকজন আসে নাই তখনও।

নিকটেই একটি বিদ্যায়তন। একটি সেমিনার। এই সেমিনারের উদ্যোগেই সভা। ওখানকার লাইব্রেরীয়ান হিউম সাহেব। আমাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "আমাদের লাইব্রেরী দেখুন।" নিজেই দেখাইতে লাগিলেন। সবশেষে একটা কোঠায় নিলেন, তার দুয়ারে বিজ্ঞাপন "গীতা সেকসন্"।

সাহেব কয়েকটি আলমারী খুলিয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন, দেখুন এই বার আপনাদের গীতা। বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দেড় হাজার গীতা আমাদের আছে। আমরা গীতাকে শ্রদ্ধা করি। এখানে সপ্তাহে একদিন গীতার ক্লাস হয়। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ব্যাখ্যানসহ দেড় হাজার গীতার সমাবেশ দেখিয়া আমার দেহে পুলক হইল।

হিউম সাহেব বলিলেন, "পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির ভাষায় গীতা অনূদিত হইয়াছে। পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের বিক্রয় সর্বাধিক। তাহার পরেই গীতার স্থান। সাহেবের এই সুন্দর উক্তিটি আমি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিলাম।

কিছুক্ষণ পর যথাকালে সভা আরম্ভ হইল। আমি ধর্মকথা বলিতে বলিতে গীতার প্রসঙ্গ তুলিলাম। হিউম সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিলাম। বলিলাম, "এইমাত্র লাইব্রেরীর মি: হিউম আমাকে বলিলেন যে, ধর্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের পরই গীতার স্থান। তাঁহার এই কথা ধরিয়া আমি একটি নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। সিদ্ধান্তটি এই যে, তাহা হইলে বাইবেল অপেক্ষা গীতার মর্যাদা অধিক। এইরূপ সিদ্ধান্ত আমি কেন করিতেছি তাহার হেতু বলিব।

আপনাদের বাইবেল যে বাজারে চলে তাহার পেছনে আছে বাইবেল সোসাইটির লক্ষ লক্ষ টাকা। আর আছে পাদ্রী মিশনারীদের অক্লান্ত খাটুনী। পক্ষান্তরে গীতার পিছনে এইরূপ কিছুই নাই। একটি বস্তু চলিতে পারে দুই প্রকারে। হয় ঠেলা না হয় টান। হয় *push* নয় *pull* বাইবেল চলিতেছে পিছনের ধাক্কায়। গীতা চলিতেছে বিশ্বমানবের প্রাণের টানে। কাহার মহত্ত্ব কিরূপ আপনারাই বিচার করুন।

যদি পরীক্ষা করিতে চান—একবছর বাইবেলের পিছনের প্রচারণের ধাক্কাটি থামান, অথবা তাহা না পারিলে একবছর গীতার পেছনে কিছু খরচ করুন। প্রতি রবিবারে গির্জার উপাসনান্তে একটিবার মাত্র বলিবেন, "গীতা ভাল গ্রন্থ—সকলেই পড়িতে পারেন।" দেখুন না সেই বছর গীতা বিক্রয় কিরূপ। বাইবেলের সমান তো হইবেই। ছাড়াইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কথাটা বলিবার সময় আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বক্তৃতার পর তাহা মনে হইল না। সকলের মুখেই আনন্দের হাসি দেখিলাম। বহু সজ্জন আসিয়া আমার আশেপাশে ভিড় জমাইলেন। অনেকে করমর্দন

করিলেন —— কহিলেন, "আমরা গীতা ভালবাসি।" একজন থিওসফিস্ট বলিলেন, "আমরা তো গীতাকেই বাইবেল করিয়া লইয়াছি।" আমি বলিলাম গীতাও বাইবেলে প্রচারিত মূল তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্যত নাই। এই দেখুন বাইবেল বলিয়াছেন ——

"Love thy lord with all thy soul
With all thy mite with all thy spirit."

গীতাও বলিয়াছেন —"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ" কথা একই হইল।"

থিওসফিস্ট সাহেব বলিলেন, "কথা একই তবুও একটু তফাৎ আছে। বাইবেলের ওপর একটি Creed (মতবাদ) তৈয়ারী হইয়াছে, গীতার ওপর তাহা হয় নাই।"

সাহেবের সত্য দৃষ্টি দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠিকই বলিয়াছেন, গীতায় আপনি কি মানেন বা বিশ্বাস করেন তাহা বড় কথা নয় —— আপনি কি করেন তাহাই বড় কথা।

Not what you believe but what you do, matters. গীতার মত লইয়া কোন দল গড়ে নাই। তাইতো গীতা সকল দলের উপরে রহিয়াছে। (২৪)

(খ)

গীতার সার্বভৌম বাণীটি কি? গীতার উপদেশ কোন ঐতিহাসিক কাল বা ভৌগোলিক স্থান বিষয়ে নিরপেক্ষ। দ্বাপর যুগের অন্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের বাণীরূপ গীতা উদ্‌ঘোষিত হইলেও বস্তুত তাহা সর্বকালীন, সার্বভৌম, সার্বজনীন জ্ঞানরাশি। কোন দেশের কোন জাতি বা দলকে কোন কালে বা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। গীতার উপদেশ মানবের প্রতি। তার লক্ষ্য —— একটি মানব বা প্রত্যেকটি মানব (Individual)। এখানেই ইহার সার্বজনীনতা। প্রত্যেকটি মানব বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মনে করে যে ইহা আমার প্রতি উপদেশ। বিষয়টি আরও বিশদ করা যাইতেছে।

প্রত্যেকটি মানবের মনে তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে। চিন্তা ইচ্ছা ও অনুভূতি —— চিন্তাশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ভালবাসিবার শক্তি। সাধারণ মানুষের এই শক্তি তিনটির কার্য ছোট বড় গণ্ডী বা সীমার মধ্যে আবদ্ধ। মহৎ ব্যক্তির এই শক্তিত্রয়ের ক্রিয়া অসীমকে লইয়া অথবা ভাষান্তরে ঐ শক্তিত্রয়ের কার্যকারিতা যখন সকল সীমা ছাড়াইয়া অসীমে অনন্তে ঈশ্বরে পৌঁছায় তখনই উহাদের অনুশীলনের পরিপূর্ণতা হয়। যে মানুষের তাহা হইয়াছে সেই জগতের মহাপুরুষ।

সাধারণ মানুষ ভাবনা করে (Thinking) সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রবস্তু লইয়া। মহাপুরুষ ভাবনা করেন অসীম অনন্তের বিষয় লইয়া। তাহার অসীমের মধ্যে সসীমের মন্ত্র গুপ্ত থাকে। সাধারণ লোকের কর্ম করিবার ইচ্ছা (willing) গণ্ডীবদ্ধ কোন স্থানকালকে কেন্দ্র করিয়া মহৎ ব্যক্তিরা কর্ম করেন সর্ব মানবের কল্যাণার্থ। সাধারণ লোকের স্নেহ প্রীতি অনুরাগ কোন সীমাবদ্ধ পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রকে লইয়া। মহদ্ব্যক্তির অনুরাগ অসীম অনন্তের প্রতি। তাহার ফলে সৃষ্ট সকল জীবের প্রতি।

ক্ষুদ্র সীমার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া — নিম্নকে ঊর্ধ্বে, খণ্ডকে অখণ্ডে, অনুকে ভূমায় লইয়া যাইবার মহত্তর বিকাশে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি? যে শক্তি-ত্রয়কে আশ্রয় করিয়া মানবত্বের বিকাশ তাহাকে ঊর্ধ্বায়িত ভূমাব্যাপ্ত করিবার কৌশল কি? গীতা তাহা বলিয়াছেন — শিখাইয়াছেন। ইহাই গীতার যোগ। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। এইটি বিশ্বমানবের কাছে গীতার শ্রেষ্ঠ দান।

গীতা বলিয়াছেন তোমার জ্ঞান হউক শুদ্ধ, সর্বমানবীয় পবিত্র, কর্ম হউক নিষ্কাম, বিশ্বকল্যাণকামী, অনুরাগ শুদ্ধপ্রেমে পরিণত হইয়া ভগবান ও তাঁহার সৃষ্ট জীবকুলের প্রতি প্রধাবিত হউক। গীতা বলিয়াছেন — ঈশ্বরকে ভালবাস, আর তাঁহার প্রিয় মানবকে ভালবাস, অহংকার ত্যাগ করিয়া কামনাশূন্য হইয়া, কর্মকর তোমার নিজের বা পরিজনের জন্য নয় কেবল, সর্বভূতের কল্যাণে। ঈশ্বর প্রেমের পরিণতি হউক পবিত্র জ্ঞানে, স্বার্থগন্ধহীন সেবায়।

গীতার উপদেশ প্রত্যেকটি মানবের প্রতি ক্ষুদ্র অহংকার শূন্য হও। প্রকৃত অহং বা আত্মাকে জান। জ্ঞানে প্রেমে সেই এক অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব কর। এই অনুভবের প্রকাশ হোক জগদ্ধিতায় বিশ্বের কল্যানে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া নিজেকে বিশ্বে সর্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত করা, উপলব্ধি করা, নিবেদন করাই গীতার আদর্শ। বেদান্ত রত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধার করি —

"শ্রীভগবান সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীবকে সচ্চিদানন্দে পূর্ণ বিকশিত হইতে হইলে এই মার্গত্রয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেইজন্য গীতায় দেখি কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গম রচনা করিয়াছেন। সেই পুণ্যতর কল্যানতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে প্রবহমান।"

শ্রীভগবানের মুখ হইতে আবির্ভাবের পর মুহূর্ত হইতেই মানবজীবন সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদগীতা মহাস্ত্ররূপে সতত ক্রিয়াশীল। সর্বশাস্ত্রময় প্রস্থান—ত্রয়ীর সারভূতা গীতা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জীবনধারাকে—জ্ঞান ভক্তি কর্মসমন্বিত যুক্ত ত্রিবেণীর ন্যায় গঙ্গা প্রবাহের মত—পুষ্ট, সমৃদ্ধ, পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাকে কীভাবে ইহা প্রভাবিত করিয়াছে তাহার আলোচনা পূর্বে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। এই আলোচনা মুখ্যত পূর্বাচার্য ও পণ্ডিতগণের মহামূল্য মন্তব্য হইতে সমাহৃত এবং আমাদের আলোচিতব্য বিষয়ের মুখবন্ধমাত্র। এখন বাঙালীর সমগ্র জীবনধারা হইতে কী কারণে একটি খণ্ডাংশকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ হইতে বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত পঞ্চাশবৎসর কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা বলা প্রয়োজন।

ব্যক্তির জীবনে বিপর্যয় ও অভ্যুদয়ের মত জাতি এবং সমাজের জীবনেও উত্থান ও পতন আছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও নিজের জীবন ধারাটি অক্ষুন্ন থাকে—জাতীয় জীবনেও তেমনি মূল ধারাটির কদাচ অবলুপ্তি ঘটেনা। ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হইতে ধীরে ধীরে ব্রিটেন তথা পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে পরিচয়ে নব বঙ্গের তথা আধুনিক ভারতের যে পরিবর্তন আরম্ভ হইল—যে ভাব বিপ্লব, আদর্শ সংঘাত, জীবন জিজ্ঞাসা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার অন্তরালে ভারতীয় জীবন সাধনার প্রস্রবনটি ক্ষীণ—অনেকখানি অন্তঃসলিলা হইলেও প্রবাহিত ছিল। তাহার নব উৎসার লক্ষ্য করা গেল রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে। রামমোহন মুখ্যতঃ উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া বিচার যুদ্ধে অবতীর্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এবং ব্রাহ্মধর্ম নিরূপনের—উপনিষদসার গীতাও ছিল অন্যতম প্রহরণ।

শুধু ভারতে নহে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক হইতে ফরাসী বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া তরঙ্গে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, সাম্য মৈত্রী স্বাধনতা মন্ত্রে মানব মুক্তির যে বিপুল তরঙ্গোচ্ছাস ভারতের নবজাগ্রত চিত্ততল আপ্লুত করিয়াছিল রামমোহন তাহাতে অবগাহন করিলেন এবং জাতীয় চেতনায় নূতন রঙ লাগাইয়া ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ, সতীদাহ বহুবিবাহাদি প্রথার নিবর্তন, বিধবা বিবাহাদি প্রথার প্রবর্তন, সংবাদ পত্রাদির প্রচার ইয়ং বেঙ্গলের উদ্ভব প্রমুখ বিবিধ ও বহুমুখী কর্মোদ্যমে বাঙালীর চিত্ততল আলোড়িত হইয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন — দীনবন্ধু — বঙ্কিমচন্দ্র — হেমচন্দ্র — নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিমণ্ডলী নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম ও উপাসনার বিচিত্র বিকাশ পথে নূতন নেতৃত্ব লইয়া আসিলেন দেবেন্দ্রনাথ — কেশবচন্দ্র — শ্রীরামকৃষ্ণ — বিবেকানন্দ প্রমুখ আচার্যগণ। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বিশেষত: শেষ পাদটি শুধু ভাবে, আদর্শে ও চিন্তায় নহে — বিবিধ কর্মোদ্যমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই লর্ড কার্জনের বৃটিশ কূটনীতির অবদান প্রথম বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটিল। বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ — বিপিন পাল — শ্রীঅরবিন্দ — অশ্বিনীকুমার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে নামিলেন, গুলিগোলা বর্ষিত হইল, আগুন জ্বলিল, নির্যাতন — লাঞ্ছনা — মৃত্যু, দ্বীপান্তর ফাঁসি নানাদিকে বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর তাহার প্রকাশ। ইহার মধ্যে আসিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঘাযতীন — রাসবিহারী প্রভৃতির বিপ্লব প্রয়াস। যুদ্ধান্তে জালিওয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হইল তাহার নেতৃত্বে আসিলেন মহাত্মা গান্ধী — ভারতের প্রথম রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের তথা অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের মহানায়করূপে।

ইউরোপ খণ্ডে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হইল, তুর্কিতে মাথা তুলিলেন কামাল আতাতুর্ক, চীনে সানিয়াৎসেন মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল লীগ অব নেশানস্। আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণের নির্লজ্জ প্রয়াসের দোটানায় নূতন সংকটের উদ্ভব হইল। এই সংকটের বৃন্তে একটি নূতন ফল ফলিল। অ্যাডলফ্ হিটলার ও নাৎসী দল তাহা হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তাহার প্রতিক্রিয়া।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আধ্যাত্মদর্শন ও কর্ম সংস্কৃতির মূল হোতা ছিলেন পূর্বার্ধে রাজারামমোহন তার উত্তরার্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ভাবধারায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ—— কেশবচন্দ্র—— বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীবর্গ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারক ধারারই একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবাহ। সাহিত্য ধারার নেতৃত্ব ছিল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভগীরথ মধুসূদন মুখ্যতঃ ছিলেন সাহিত্যের বহিরঙ্গরূপে প্রতিবদ্ধ দৃষ্টি সুতরাং তাঁহার রচনাতে ভারতের আত্মা তথা শাশ্বত আদর্শ—— আধ্যাত্মিক সম্পদ অন্তরঙ্গ পরিচয়ে—— বিকশিত হইয়া উঠেনাই। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই মধুসূদন প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ রূপরীতির ক্ষেত্রে যে মুক্তি তথা রূপান্তর আনিয়াছিল তাহাই প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অনুসৃত ও অনুশীলিত হইয়াছে কিন্তু সেই তুলনায় ভাবগত দিকটি সমর্থন লাভ করে নাই। বাংলা সাহিত্যের তথা বাঙালী জীবনের সাংস্কৃতিক ধারটির সর্বাঙ্গীন রূপায়ণ হইয়াছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এবং তাহার সাহিত্য সংস্কৃতি ধারায়ই উত্তরকালের বাংলা সাহিত্য কেতো বটেই বাঙালী জাতিকেও তথা সমগ্র ভারতবর্ষকেও নবচিন্তা এবং নব কর্মোদ্যমের পথে পরিচালিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধার করি—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন, তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিলনা। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।

কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব---- যেখানে যখনই তাহার আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গ ভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।" (আধুনিক সাহিত্য)।

~~আধুনিক সাহিত্য~~ কিন্তু কেবল সাহিত্য ক্ষেত্রেই নহে, বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরপর্বে জাতি গঠনের কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ---- যাহার ফল আনন্দমঠ — দেবীচৌধুরাণী সীতারাম, কৃষ্ণচরিত্র — ধর্মতত্ত্ব ---- শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

সিপাই বিদ্রোহকে (১৮৫৭) এখন স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলা হয়। বিদ্রোহের প্রথম গুলিটি বাহির হইয়াছিল বঙ্গদেশে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাঁড়ের বন্দুক হইতে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী এই যুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে এবং ইংরাজ প্রভুর পক্ষে কাজ করিয়াছিল। সমকালে লিখিত প্রতিটি গ্রন্থে তাহার বিবরণ সুস্পষ্ট। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে লিখিয়াছিলেন এই বহুস্মরণীয় উৎসাহবাণী।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়—
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়—
কোটি কল্পদাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়—
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।"

সেই পদ্মিনী কাব্যেরই উপান্ত শ্লোক দুইটি এই—

ভারতের ভাগ্যজোর দুঃখ বিভাবরীভোর—
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর।
ইংরাজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী মাঝে সুখ সর রুহ রাজে
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময় বিদ্রোহ বারিদচয়—
আর যেন বিঘ্ন না বরিষে ॥

পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।

রাজ শক্তির বিপক্ষে কিছু বলার ঝুঁকি আছে কাজেই চাপিয়া গেলাম—ইহা তাহা নহে। ইংরাজ রাজত্ব ভারতের পক্ষে তৎকালে মঙ্গলকর হইবে এমন একটা বিশ্বাস তখন বহুলাংশে অকপট ছিল। যাহা হউক সিপাহী বিদ্রোহে বন্দুক না ধরিলেও বিদ্রোহোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে স্বাধীনতাপ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধন হইয়াছিল বাঙালী সাহিত্য সেবকদিগের কলমে—তাহার সূক্ষ্ম প্রেরণার উৎস ছিল যে নানাসাহেব—লক্ষ্মীবাই প্রমুখ বিদ্রোহী নরনারীর আত্মত্যাগ, তাহাতে আর কোন ঐতিহাসিকেরই সংশয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র লেখার মধ্যদিয়া যে ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের যে নূতন উজ্জীবন হইল ভারতীয় জাতীয়তা, মানবতা, দেশ ও মানব সেবার বহুমুখী কর্মে যে বিপুল উদ্যম উৎসারিত হইল পরবর্তী ইতিহাস

তাহারই সম্প্রসারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব, বিবেকানন্দের আমেরিকা গমন ও প্রচার ভারতকে নূতন আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রায় সমকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ভারতচর্চা —— ম্যাক্সমূলার সাহেবের What India can teach us ও Sacred Books of the East প্রমুখ বহু গ্রন্থের প্রকাশ, ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউশান, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ভারতকে এক উজ্জ্বল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। ঊনিশ শতকের শেষ পাদ হইতে বিংশ শতকের প্রথ পাদ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে এই নব জাগরণের প্রকাশ সমাজ ও সাহিত্যে অধিকতর প্রকট হইয়াছিল। আর এই প্রভাবের মূলে যে গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তথা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার নাম গীতা। ইহা যে কেবল বঙ্গদেশেই ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সর্বভারতেই ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। তবে আমাদের আলোচনা আমরা যথাসম্ভব বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিব। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে গীতার প্রভাব ও প্রেরণা সম্বন্ধে একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া নিলেও ইহার অর্থ নিশ্চয় এমন কিছু নহে যে, এই সময়ের পূর্বে বা পরে বাঙালীর তথা ভারতীয় জীবনে গীতা প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়াছিল। আমাদের আলোচনায় আমরা যথাসম্ভব ইহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সমাজ পর্ব ও সাহিত্য পর্ব এই দুই ভাগে আলোচনা করা হইল। সমাজ ও সাহিত্যের যোগাযোগ এত নিগূঢ় যে ইহা অনেক সময় আলাদা করিয়া দেখানো অসম্ভব হইয়া পড়ে কারণ সমাজের উপাদান লইয়া রচিত হয় সাহিত্য আবার সাহিত্যের ভাবধারা কর্মরূপ গ্রহণ করিয়া সমাজের পরিবর্তন সাধন করে। তবু যথাসাধ্য দুইটিকে আলাদা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু মাঝে মধ্যে বিষয়ের ও বক্তব্যের পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনের জন্য স্বতন্ত্র তিনটি অধ্যায় রচিত হইল। অন্যান্য সাহিত্যিক প্রয়াসের জন্য ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতক মোটামুটি এই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — গীতাধ্যান ষষ্ঠ খণ্ড ২ সং পৃ:
২। তদেব — পৃ:
৩। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — চণ্ডীচিন্তা ৩ সং পৃ: ১৩৩
৪। স্বামীজগদীশ্বরানন্দ — শ্রীমদ্ভগবদগীতা উদ্বোধন, ৫ সং পৃ: ২৫—৩৩
৫। সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের মাত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪ খণ্ড, পৃ: ৫১৬
৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী — বেদান্তদর্শনের ইতিহাস ১ ভাগ পৃ: ১৬৭
৭। শঙ্করাচার্য — গীতাভাষ্য ৩।১৯ শ্লোক
৮। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী — বেদান্তদর্শনের ইতিহাস পৃ: ২১৪—২১৫
৯। গীতাভাষ্য পরিব্রজ্যা — শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ভূমিকা
শ্রী অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ
১০। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী— বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস ৩য় ভাগ পৃ: ৮১৩
১১। তদেব — পৃ: ৭৬৫
১২। ডঁ: মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের ভূমিকা পৃ: ।।৯
১৩। গীতাভাষ্য পরিব্রজ্যা — শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী শ্রী অতুলচন্দ্র সেন
সম্পাদিত গীতার ভূমিকা ৩ সং পৃ: ৩৮
১৪। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী— বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস পৃ: ৩৬৩
১৫। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — ব্রহ্ম গায়ত্রী ৫ সং পৃ: ১০—১১
১৬। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ — চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ
১৭। শ্রী হরিদাস দাস — গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩ খণ্ড, পৃ: ১৪৯৮
১৮। তদেব — পৃ: ১৯৯০—৯১
XXXXশ্রীকৃষ্ণ
১৯। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ — চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ.
২০। বালগঙ্গাধর তিলক — গীতারহস্য, অনু—জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ১
২১। তদেব —X পৃ: ১৬
২২। তদেব — পৃ: ২২
২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — নৈবেদ্য কবিতা সংখ্যা ৯৪
২৪। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — গীতাধ্যান ২য় খণ্ড পৃ: